দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 28 MAR 1989
পৃষ্ঠা ... 1 ... কলাম ...

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

28 MAR 1989

036

ঘরে-বাইরে

— সন্ধানী

অবক্ষয় কি চরম রূপ নিয়েছে চলতি এস-এস-সি পরীক্ষা এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ। পরীক্ষা শুরু হয়েছে আজ সাত-আট দিন। শেষ হতে আরও দু-একদিন বাকী। এরিমধ্যে প্রায় ১০ হাজার ছাত্র-ছাত্রী বহিষ্কৃত হয়েছে। ঠিকমত কড়া ব্যবস্থা নিলে আরও বিশ-বাইশ হাজার বহিষ্কৃত হতে পারত। কারণ, শহরে-বন্দরে, বিশেষতঃ উপজেলা পর্যায়ের সেন্টারগুলোতে নকল হয়েছে দেদার। ছাত্র-ছাত্রীরা রীতিমত বই-পুস্তক খুলে নকল করেছে। বাইরে থেকে সাপ্লাই এসেছে অজস্র। এরচেয়েও বড় দুর্ভাগ্য এবং লজ্জার কথা যে, চলতি বছর শিক্ষকদের একটি অংশ যে কাণ্ড করেছে শিক্ষার নৈরাজ্যের ইতিহাসেও এর নজীর নেই। এক শ্রেণীর শিক্ষক ছাত্র-ছাত্রীদের প্রশ্নের উত্তর বলে দিয়েছেন। নকল দিয়ে সাহায্য করেছেন। এমনকি পরীক্ষার্থীর হয়ে পরীক্ষাও দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, আরও লজ্জাজনক কাজ করেছেন একজন প্রধান শিক্ষক। তিনি তাঁর এস-এস-সি পরীক্ষার্থী পুত্রের জন্য অসুস্থতার মিথ্যা সার্টিফিকেট যোগাড় করে বাসায় পারিবারিক পরিবেশে পরীক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। নৈতিকতার মুণ্ডুপাতের ইতিহাসে এর চেয়ে জঘন্য কোন ঘটনার দৃষ্টান্ত আছে কিনা জানি না। তবে এই শিক্ষাবিদের পুত্র যদি চরিত্রভ্রষ্ট কুলাঙ্গার হয় তাহলে এর জন্য দায়ী হবে কে? কোন কোন মহল এস-এস-সি পরীক্ষার এসব কাণ্ড-কীর্তি দেখে দুঃখের সাথে বলেছেন যে, অসততার ইতিহাসে আমরা বিশ্ব রেকর্ড তৈরী করতে চলেছি। প্রশ্ন হচ্ছে, এই যে নকলের হিড়িক, এই যে নৈতিকতার চরম অবক্ষয়, এর কারণ কি?

অতীতে নকল করার জন্য মূলতঃ ছাত্র-ছাত্রীদের অভিযুক্ত করা হয়েছে। বলা হয়েছে, সারা বছর এরা লেখা-পড়া করে না, ডাংগুলি খেলে বেড়ায়, আর পরীক্ষা এলে নকল করে। [illegible]। বস্তুতঃ চলতি বছর ছাত্র এবং এক শ্রেণীর শিক্ষক ও অভিভাবক মিলে এমন সব কাণ্ড করেছে যার জন্য এককভাবে কাউকে দায়ী করা যাচ্ছে না। শিক্ষক যদি শিক্ষকতার ধর্ম ভুলে নকল সাপ্লাই করে, অভিভাবক যদি পুত্র-কন্যাদের চৌর্যবৃত্তিতে সহায়তা দেয়, তাহলে জাতির অবক্ষয়ের চেহারাটাই স্পষ্ট হয়ে উঠে। তেমন অবস্থায় স্বীকার না করে পারা যায় না যে, এ আমার পাপ এ তোমার পাপ। এ পাপ জাতির জন্য কল্যাণ বয়ে আনতে পারে না। এর ফলে জাতি আরও অন্ধকারের অতলে হারিয়ে যেতে পারে। তাই গোটা বিষয়টি ভালোভাবে পর্যালোচনা করে দেখা প্রয়োজন।

পর্যালোচনার প্রথম পর্যায়েই শিক্ষা সম্পর্কে দু-এক কথা বলতে হয়। শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য দুটি। এক, শিক্ষার্থীর মননশীলতাকে পরিশীলিত করা এবং তার সৃজনশীলতায় ইন্ধন যোগানো। দুই, শিক্ষার পর যাতে কোন না কোন জীবিকার ক্ষেত্রে উপযোগী হয়ে উঠে সে ব্যাপারে সাহায্য করা। শিক্ষার প্রথম লক্ষ্যটির সাফল্য নির্ভর করে শিক্ষকের উপর। শিক্ষক শিক্ষাদান করতে পারেন না। তিনি পারেন তার সৃজনশীলতায় ইন্ধন যোগাতে। অর্থাৎ তার জ্ঞানস্পৃহা জাগিয়ে তুলতে। শিক্ষা কেবল বইয়ের পাতা মুখস্থ করা এবং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া নয়। সংযম, ভক্তি, সুচিন্তা ও একাগ্রতার উপর মননশীলতার পরিশীলন নির্ভর করে। পৃথিবীতে কেনা-বেচার সামগ্রীর অভাব নেই। কিন্তু দুটি জিনিস কোন সময়ই বেচা-কেনার পণ্যমাত্র হতে পারে না। এ দুটির একটি হচ্ছে ধর্ম, অন্যটি শিক্ষা। ধর্ম যখন বাণিজ্যিক এবং রাজনৈতিক পণ্যে পরিণত হয় তখন এর পবিত্রতা থাকে না। তদ্রূপ শিক্ষাও কেনা-বেচার পণ্য নয়। কিন্তু আজকাল হচ্ছে কি? শিক্ষকেরও অর্থকড়ির প্রয়োজন আছে। আছে ভোগ-লিপ্সা। শিক্ষক বলেই আজীবন হাফপেন্ট পরে আর আধপেটা খেয়ে দিন কাটাতে হবে এমন নয়। তাই বলে অর্থই এক্ষেত্রে প্রধান হতে পারে না। তাহলে শিক্ষার সাথে যে ব্রত জড়িত, তা আহত হয়ে থাকে। এখন যাঁরা শিক্ষা দেন তাঁরা শিক্ষক আর তখন যাঁরা দিতেন তাঁরা ছিলেন গুরু। তাঁদের মধ্যে ছিল বৈষয়িক লাভ-লোকসানের উর্ধ্বে উঠে মঙ্গলের জন্য শিক্ষাদানের অভিলাষ। এখন এর অভাব প্রকট, এখন প্রাইভেট পড়ুয়া ছাত্রের পরীক্ষার ফল ভাল করার জন্য শিক্ষক নকল সাপ্লাই করেন। কারণ, তিনি জানেন ফল যদি ভাল না হয় তাহলে তার ব্যবসায় ভাটা পড়বে। ও হাটে কেউ ছাত্র নিয়ে হাজির হবে না। ফলে, আয় কমে যাবে। বলা বাহুল্য, শিক্ষকদের একাংশে এ প্রবণতা দেখা দেওয়ার ফলে ছাত্রদের ভক্তিভাব হ্রাস পেতে শুরু করেছে। কারণ, ভক্তি জঙ্গলের আগাছার মত জন্মায় না। শিক্ষকের প্রতি ছাত্র-ছাত্রীর ভক্তি জন্মানোর একটা বড় কারণ হচ্ছে শিক্ষকদের উচ্চ মূল্যবোধ, শিক্ষাদানের প্রতি আগ্রহ, এমনকি তাঁর চলন-বলন পর্যন্ত। যা দেখে রুচি হয় না তা খেতেও ভাল লাগে না। যে শিক্ষকের পোশাক-পরিচ্ছদ দেখলে চোখ ফিরিয়ে নিতে হয় এবং যার সম্পর্কে এ ধারণা জন্মায় যে, টাকা না দিলে তিনি পড়াশোনায় সাহায্য করতে চান না, তাঁর প্রতি ছাত্রদের ভক্তি ভাবও জাগতে পারে না। অপ্রিয় হলেও সত্য যে, আমাদের দেশে কম-বেশী তাই হচ্ছে। একে আরও তীব্র করে তুলছে এক শ্রেণীর অভিভাবক। এটা জানা কথা যে, ছেলেমেয়ের প্রথম পাঠ শুরু হয় তার পরিবারে। স্বরবর্ণ, ব্যঞ্জনবর্ণে পাঠ নেওয়ার আগেই সে মা-বাবা, ভাই-বোনের কাছ থেকে কিছু জিনিস শিখে নেয়। পারিবারিক পরিবেশ যদি আবিলতামুক্ত হয় তাহলে সে একভাবে বড় হয়ে উঠে। ব্যতিক্রমে হয় ভিন্ন। তাই পারিবারিক পরিবেশে মূল্যবোধের অনুশীলন ও নৈতিকতা থাকা বাঞ্ছনীয়। কিন্তু বাস্তব অবস্থা কি? এক শ্রেণীর পরিবার আছে—যে পরিবারে আয়ের চেয়ে ব্যয় বহু বেশী। এ বাড়তি ব্যয়ের অর্থ পিতা বা অভিভাবক কোথা হতে সংস্থান করেন প্রায়শঃই তা ছেলেমেয়ের কাছে বলা হয় না। কিন্তু না বললে কি হবে। সত্য নিজেই প্রকাশ হয়ে পড়ে এবং ছেলেমেয়েও তা বুঝতে পারে। ফলে, মা-বাবার হিতোপদেশ শুনে সে চুপ করে থাকলেও অবচেতন মনে সৃষ্টি হয় নানা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া। আপন ঘর হতেই সে পায় অনৈতিকতার পাঠ। বড় হওয়ার পর স্কুল-কলেজে গিয়ে এবং জীবনের অন্য দিকে তাকিয়েও সে একই অবস্থা দেখে। সে দেখে যারা বড় বড় কথা এবং ভাল ভাল কথা বলে তারাই এর নিকুচি করে বেশী। এসব দৃশ্য ও ঘটনা তার মনস্তাত্ত্বিক জগতে নানা আলোড়ন সৃষ্টি করে। ভাল-মন্দের ভেদাভেদ হয়ে আসে ক্ষীণ।

বলা নিষ্প্রয়োজন যে, চারপাশের জগতে নৈতিকতা বিরোধী কাজের আয়োজনই বেশী। এর মধ্যে কোন একটি শ্রেণী বা মহল বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মত অবস্থান করবে এ আশা করা যায় না। আর যায় না বলেই নকল সমস্যা সমাধানের বিষয়টি শুধু পরীক্ষা পদ্ধতি বা এ জাতীয় কিছুর মধ্যে সন্ধান না করে আরও গভীরে নজর দেওয়া প্রয়োজন। দেখা দরকার, শিশু-কিশোর এবং তরুণদের জন্য আমরা কি রচনা করে চলেছি। বলা নিষ্প্রয়োজন যে, সমগ্রভাবে বিষয়টি না দেখে প্রতিকারের চেষ্টা করা হলে সে চেষ্টা পণ্ড হতে বাধ্য।

চলতি বছরের এস-এস-সি পরীক্ষার ঘটনাপ্রবাহ যেমনি লজ্জার, তেমনি দিকনির্দেশক। গত ক' বছরে শিক্ষা ক্ষেত্রে কি নৈরাজ্য সৃষ্টি ও পতন ঘটেছে এ তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এরপরও যদি গোড়া ধরে টান দেওয়ার চেষ্টা করা না হয় তাহলে শিক্ষার মানের যে অধোগতি ঘটবে তাতে আফ্রিকা হতে লোক আমদানী করেও হয়তো পার পাওয়া যাবে না।